উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিশ্বের শীর্ষ ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম
হযরতুল আল্লাম মুফতী আবুল কাসেম নোমানী সাহেব দা.বা. এর ঐতিহাসিক বয়ান
(স্থানঃ মদীনাতুল উলূম মাছনা মাদরাসা, মনিরামপুর, যশোর। সময়ঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী,২০১৩ ঈঃ, শুক্রবার)

قال النبى صلى الله عليه وسلم : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين.

وقال ايضا : ان العلماء ورثة الانبياء....

وقال ايضا : ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها...

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন! এখন এখানে যে সম্মেলন হচ্ছে এটা জনসাধারণের সম্মেলন নয়; বরং এটাতো উম্মাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তথা উলামায়ে কেরামের সম্মেলন। আর উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব দুই ধরণের।

একটি হলো হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়ারিশ এবং নববী ইলমের ধারক-বাহক হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ থেকে যৌথভাবে অর্পিত দায়িত্ব ।

অপরটি হলো, নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রত্যেকের পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব। যেমনঃ কেউ মুহতামিম, কেউ প্রধান শিক্ষক, কেউ শাইখুল হাদীস, কেউ সাধারণ শিক্ষক, আবার কেউ ইমাম বা খতীব। আর কেউ ওয়ায়েজ।

এই বৈঠকে আপনাদেরকে ওয়াজ করে শুনানো আমার উদ্দেশ্য নয় যেমনটি করা হয় সাধারণ মানুষের জন্য। আপনারা তো সকলেই জ্ঞানী-গুণী এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। অতএব, বলা যায় আমাদের আজকের এই বৈঠক একটি পর্যালোচনামূলক বৈঠক। আর পর্যালোচনার বিষয় এইঃ বর্তমানে সারা বিশ্বে, বিশেষত আপনারা যে দেশে বসবাস করেন সেখানকার দ্বীনী হালত কোন পর্যায়ের? এবং এ অবস্থায় আমাদের কাছে দ্বীনের চাহিদা ও আবেদন কী?

শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে যদিও উলামায়ে কেরামের মাঝে কিছুটা ভিন্নতা আছে। কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও আদর্শগতভাবে সকলে এক ও অভিন্ন। কেউ কাসেমী (দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ) কেউ মাজাহেরী (মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর থেকে ফারেগ) কেউ থানভী (হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর সিলসিলার কোনো শাইখের সাথে সম্পৃক্ত) কেউ মাদানী (হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত) কেউবা হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত। মোটকথা তারা সকলে তরবিয়াত ও দীক্ষাগতভাবে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত এবং তা‘লীম ও শিক্ষাগতভাবে ‘দারুল উলূম দেওবন্দ’ এর চিন্তা-চেতনার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ সম্পর্ক ও বন্ধন আরো মজবুত করা চাই।

আমি আপনাদের সামনে ভূমিকাতে তিনটি হাদীস পাঠ করেছি। সাধারণত কোনো বক্তা বয়ানের শুরুতে যে আয়াত ও হাদীস পড়েন আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তি তা শুনেই বুঝতে পারেন যে, বক্তা কী বলতে চান।

আমার ভাইয়েরা! আমার প্রথম কথা হলো, উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও অবস্থান কী? এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? তো এ প্রসঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ان العلماء ورثة الانبياء অর্থাৎ আলেমগণ নবীগণ আ. এর ওয়ারিশ। এখন প্রশ্ন হল, ওয়ারিশ কে হয়? তো দুনিয়ার ব্যাপারে ওয়ারিশ ঐ ব্যক্তি হয় মৃত ব্যক্তির সাথে যার আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে এবং উত্তরাধিকার সত্ত্ব থেকে বঞ্চিতকারী কোনো কারণ না থাকে। কেননা এমন কোনো কারণ দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা স্বত্বেও উক্ত ব্যক্তি মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়। মীরাছ পাওয়ার সূত্র হল আত্মীয়তা। কিন্তু শুধু আত্মীয়তা মীরাছ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং নিকটাত্মীয় হওয়া জরুরী। যেমনঃ মৃতের ছেলে থাকা অবস্থায় মৃতের ছেলের ছেলে মীরাস পায় না। আর মৃতের আপন ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই মীরাছ পায় না। কারণ নাতীর তুলনায় মৃতের সাথে মৃতের ছেলের এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের তুলনায় মৃতের সাথে আপন ভাইয়ের আত্মীয়তা অধিক নিকটবর্তী ও বেশি শক্তিশালী । নিকটাত্মীয়তা থাকা সত্ত্বেও মীরাছ থেকে বঞ্চিতকারী কোনো কারণ ঘটা বা পাওয়ার উদাহরণ এই যে, কোনো ছেলে যদি পিতার যাবতীয় সম্পদ একাই দখল কারার জন্য পিতাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এই ছেলে পিতার সম্পদ থেকে কিছুই পায় না। অথচ নিজ পিতাকে হত্যাকারী এই ছেলেকেও তার ছেলে বলা হয়, তার পুত্রত্বকে অস্বীকার করা হয় না।

মোটকথা, জাগতিক সম্পদে ওয়ারিশ হতে হলে মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা ছাড়াও নিকটাত্মীয় হওয়া এবং মীরাছ থেকে বঞ্চিতকারী কোনো কারণ না থাকা আবশ্যক।

আমার ভাইয়েরা! এটাতো দুনিয়াবী সম্পদে ওয়ারিশ হওয়ার ভিত্তি ও নীতিমালা। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমে নবুওয়াত এর মীরাছ পাওয়ার জন্য আত্মীয়তা বা বংশীয় সম্পর্কের পরিবর্তে নিসবতকে ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর সেই নিসবত বা সম্পর্ক হলো তিন ধরণের।

এক. রূহানী নিসবত বা আত্মিক সম্পর্ক।
দুই. ফিকরী নিসবত বা চিন্তা-চেতনাগত সম্পর্ক।
তিন. আলমী নিসবত বা যে লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমের ওয়ারিশ হতে চাইলে, সত্যিকারের আলেম হতে চাইলে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রূহানী, ফিকরী ও আমলী নিসবত থাকা জরুরী। এই নিসবত ছাড়া কেউ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমের ওয়ারিশ হতে পারবে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমের ওয়ারিশ হওয়ার ভিত্তি শুধু এতটুকু নয় যে, কেউ একজন দ্বীনী মাদরাসা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে, সেখানের নেসাব পড়ে শেষ করবে, বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করবে, অতঃপর উক্ত মাদরাসা থেকে একটি সনদ লাভ করবে। সনদ তো উক্ত মাদরাসার শিক্ষা সমাপ্ত করার একটি সাক্ষ্য প্রদান মাত্র যা شهادة الفضيلة وشهادة عالمية নামে অবহিত করা হয়। অর্থাৎ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সনদের মাধ্যমে একথার সাক্ষ্য দেয় যে, এই ছাত্রটি মাওলানা হওয়ার বা আলেম হওয়ার নির্ধারিত নেসাব পড়ে শেষ করেছে। সনদের অর্থ এই নয় যে, সে সত্যিকার অর্থে আলেম হয়েছে কিংবা নববী ইলমের ওয়ারিশ হয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন, ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم ‘নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের আ.ওয়ারিশ। আর নবীগণ আ. কোনো দীনার বা দেরহামের মীরাছ রেখে যাননি, বরং তারা ইলমের মীরাছ রেখে গেছেন’। আর এই ইলমের হুকুম, চাহিদা ও নিয়মনীতি জাগতিক সম্পদে ওয়ারিশ হওয়ার নীতিমালা থেকে ভিন্ন। কেননা বাস্তবে নববী ইলমের ওয়ারিশ হতে গেলে ঐ রূহানী সম্পর্ক জরুরী যাকে নিসবত বলা হয়। আর এই নিসবত অর্জন করা, এই নিসবতের মধ্যে শক্তি পয়দা করা এবং এই নিসবত হেফাজত করা আমাদের যিম্মাদারী। কারণ আলেমগণের ওয়ারিশ হওয়া মূলত নিসবতের উপরই নির্ভরশীল।

নববী ইলমে ওয়ারিশ হওয়া জাগতিক সম্পদে ওয়ারিশ হওয়ার মত নয়। জাগতিক সম্পদে যে ওয়ারিশ হয়, সম্পদ তার হাতে আসলেই সে ঐ সম্পদের মালিক হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে সেটা আর তার হাত ছাড়া হয় না। কিন্তু নববী ইলমের ওয়ারিশ হওয়া যেহেতু নিসবত এর উপর নির্ভরশীল, তাই যত দিন নিসবত বা সম্পর্ক ঠিক থাকবে ততো দিন আপনি নববী ইলমের প্রকৃত ওয়ারিশরূপে গণ্য হবেন। আর যখই নিসবতের মধ্যে জংধরে যাবে, নিসবতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে তখনই ইলমে নববীর ওয়ারিশের খাতা থেকে আপনার নাম কেটে যাবে। তাই সারা জীবন এই নিসবত হেফাজত করতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রূহানী সম্পর্ককে গাঢ় থেকে গাঢ়তর করতে হবে।

এখন আসুন এই নিসবত বা সম্পর্কের হেফাজত কীভাবে হবে তা জেনে নেই। তো যে মহান কাজ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরায় আগমন করেছিলেন সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে নিজের একমাত্র কাজ বানানো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্খতা ও পাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এ পৃথিবীতে যেভাবে হেদায়াতের সূর্য হয়ে এসেছিলেন এবং পরিবেশের সকল বিরোধিতা ও শত্রুতা সত্ত্বেও নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (তথা দাওয়াতী মিশন) থেকে এক কদমও পিছে হটেননি। কাফের বেদ্বীনরা দুনিয়ার বড় বড় প্রলোভন দেখিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল যে, আপনাকে সারা আরবের বাদশা বানানো হবে, আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারী আপনাকে দেওয়া হবে। আরবের গোটা সম্পদ আপনার সামনে জমা করে দেওয়া হবে। তখন নবিজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উত্তরে বলেছিলেন, ‘আল্লাহর শপথ, এসকল লোক যদি আমার এক হাতে চাঁদ আর অন্য হাতে সূর্য এনে দেয় তবু আমি আমার দায়িত্ব থেকে সামান্য পিছ পা হবো না।’

আল্লাহর ফজলে আমাদের যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়ারিশ হওয়ার মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। তাই আমাদেরকেও নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোনো লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি, হুমকী-ধমকি যেন আমাদেরকে নিজ দায়িত্ব পালন করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে। যেদিন থেকে আমরা এই ইলমের বাগানে কদম রেখেছি, সেদিন থেকে আমাদের কাঁধে এ দায়িত্ব এসে গেছে। আমাদের জানা হয়ে গেছে যে, এ পথে চলতে হলে বালা-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। এপথে আমাদেরকে কেউ জবরদস্তি ও বাধ্য করে আনেনি। আমরা নিজেরাই বুঝে-শুনে এ পথ গ্রহণ করেছি। সুতরাং এখন যত দুঃখ-কষ্ট হোক বালা-মুসীবত আসুক তবুও আমাদেরকে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে

শুধু অগ্রসর হতে হবে। পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর প্রত্যেকেই নিজের মেধাকে সজাগ রাখবে। কোনো দিক থেকে দ্বীনের খেলাফ কোনো কাজ হতে দেখলে সেটার সংশোধন করা প্রত্যেকেই নিজের একান্ত দায়িত্ব মনে করবে। কেউ এই কাজকে সবার দায়িত্ব মনে করবে না। কেননা প্রত্যেকেই যদি একথা মনে করে যে, এই কাজ করা তো সবার দায়িত্ব, আমি একা করবো কেন? তাহলে কেউ দায়িত্ব পালন করবে না। বরং একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তখন ফলাফল তাই হবে যা এক প্রসিদ্ধ ঘটনায় হয়ে ছিল। ঘটনা নিম্নরূপঃ

এক বাদশাহ ঘোষণা করলেন যে, আজ রাতের মধ্যে রাজ প্রাসাদ সংলগ্ন পুকুরে এই এলাকার প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ গাভীর দুধ এনে ঢেলে দিবে। সকালে আমি যেন পুকুরকে দুধে পরিপূর্ণ দেখতে পাই। অতঃপর প্রজাদের প্রত্যেকে এই চিন্তা করলো যে, সবাইতো পুকুরে দুধ ঢালবে, আমি একা এক বালতি পানি ঢাললে কীইবা সমস্যা হবে। অতঃপর সকালে উঠে দেখা গেল যে, সম্পূর্ণ পুকুর পানিতে পূর্ণ হয়ে আছে। কেন এমন হলো? উত্তর একটিই, প্রত্যেকে দুধ ঢালা নিজের দায়িত্ব মনে করেনি। যদি প্রত্যেকেই এই কথা ভাবতো যে, জানা নেই কে দুধ আনবে আর কে পানি আনবে, কমপক্ষে আমিতো দুধ ঢালি। তাহলে পূর্ণ পুকুর দুধে ভরে যেত। ঠিক তদ্রূপ কোনো আলেম যদি একথা ভাবে যে, আমি একা দায়িত্ব পালন না করলে কী হবে? আমি ছাড়া তো হাজারো আলেম আছেন তারা দায়িত্ব পালন করবেন, তাহলে কারো দ্বারাই দায়িত্ব আদায় হবে না।

আমরা যেসকল বুযুর্গানেদ্বীনের নাম নিয়ে আলোচনা করে থাকি, তাঁদের জীবনী খুলে দেখুন মাশাআল্লাহ ইলম ও তাকওয়ায় তারা ছিলেন আদর্শ। তাদের ব্যক্তিগত অবস্থান ছিল সুউচ্চে। এমন নয় যে, তাদের কোনো ভক্ত ও মুরীদ ছিল না, তাদের কোনো ছাত্র ছিল না এবং এমন নয় যে, তাদের ব্যক্তিগত ও জাগতিক কোনো প্রয়োজন ছিল না। বরং তাদেরও সন্তানাদি,ছাত্র, মুরীদ ও অন্যান্য প্রয়োজনাদি ছিল। তা সত্ত্বেও যখনই নতুন কোনো ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আমাদের আকাবিরগণ তা শক্ত হাতে প্রতিরোধ করেছেন। তারা সেটাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করেছেন। অধীনস্ত ও ছাত্রদেরকে এ কাজে লাগাননি বরং নিজেরা প্রথম সারিতে এসে তার মোকাবেলা করেছেন এবং ফেতনাকে উৎখাত করে ছেড়েছেন। দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির উলামায়ে কেরামের জীবনী সম্পর্কে যাদের কিছুটা অবগতি আছে, তারা হয়তো জেনে থাকবেন যে, যখন ব্রিটিশ ইংরেজরা এই উপ-মহাদেশে আগ্রাসন চালিয়ে পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের হাত থেকে রাজ্য ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলো তখন উলামা ও নেককার লোকদের বেছে বেছে ফাঁসিতে ঝুলালো, আগুনে নিক্ষেপ করলো এবং এমন হলো যে, আল্লাহ পাকের নাম নেওয়াও অপরাধ গণ্য করা হতে লাগল। সেই যমানায় আমাদের আকাবিরগণ দ্বীনে ইসলাম হেফাজতের জন্য একদিকে মাদরাসা কায়েম করলেন। আজ সেই মাদরাসার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এত বেশি হয়ে গেছে যে, মাদরাসার সংখ্যা গণনা করাই মুশকিল হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ। অপরদিকে যখন ইংরেজ সরকারের এক বড় ব্যক্তি এই ঘোষণা করলো যে, 'আমরা এই উপমহাদেশে এমন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-কারিকুলাম প্রণয়ন করবো, যেই কারিকুলাম অনুযায়ী লেখাপড়া করলে এদেশের মানুষ রং ও বর্ণে হিন্দুয়ানী থাকবে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ও কৃষ্টি-কালচারে বিলাতী তথা খ্রিস্টান হয়ে যাবে।' এহেন নাযুক মুহূর্তে আকাবিরে দেওবন্দ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজদের মোকাবিলা করার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সাথে সাথে যেখানে যেভাবে ইংরেজরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে তা মুকাবেলা করতে তারা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় যখন ইংরেজ শাসনামলে খ্রিস্টান পাদ্রীদের উপদ্রব এতই বেড়ে গেল যে, যেখানে সেখানে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ও চ্যালেঞ্জ ছুড়তে লাগলো, তখন মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ., মাওলানা রহমাতুল্লাহ কেরানবী রহ. ময়দানে নেমে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললেন।

ঐ যমানায়ই হিন্দু আর্য সমাজীদের নেতা স্বামী দিয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রকাশ্য ময়দানে এসে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুললো। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাতের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য ও ইসলামী শিক্ষাদীক্ষার উপর নগ্ন হামলা শুরু করলো এবং এই বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকলো যে, হিন্দুস্তানের সকল বাসিন্দা বংশগতভাবে হিন্দু ছিল। মোঘল সম্রাটরা তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে বা জবরদস্তীভাবে মুসলমান বানিয়েছে। আর কাফেররা তাদের অপপ্রচারে সফল হওয়ার জন্য শুদ্ধি আন্দোলন নামে একটি সংগঠন তৈরি করে ফেললো। আর ইংরেজ সরকারের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে সরলমনা মুসলমানদেরকে হিন্দু বানাতে থাকলো।

সে সময়ে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. এর মত দুনিয়া বিমুখ এবং খাঁটি ইসলাম চর্চায় ডুবন্ত ব্যক্তিত্ব মাদরাসার গন্ডি থেকে ময়দানে বের হয়ে এই ফেতনার মোকাবেলা করলেন। ইউপি, শাহজাহানপুর, এমনিভাবে পশ্চিম প্রদেশের বিভিন্ন শহরে তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করতঃ আর্য সমাজীদের সকল আপত্তি খন্ডন করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সু-প্রমাণিত করেন। সেই যমানায় ঐ সকল মুনাজারা বা তর্কযুদ্ধ নিয়ে এই কিতাবসমূহ রচিত হয়ঃ

১.মুবাহাসায়ে শাহজাহানপুর ২. কেবলানুমা ৩.জাওয়াবে তুর্কি। আল্লামা কাসেম নানুতুবীর এসকল মুনাজারা ও রচনাবলী বিরোধী পথের উপর এমন প্রভাব ফেলে যে, তাদের সামনে তিনি এক বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান। এক পর্যায়ে বাতিলের সকল প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়।

মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী রহ. খ্রিস্টান পাদ্রী ও অন্যান্য বাতিল শক্তির মোকাবেলায় ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম। ভারতের আগ্রাসহ যেখানে যখন বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তিনি তা তাড়া করে ফিরেছেন। খ্রিস্টান পাদ্রীরা তার নাম শুনলে আতংকিত হয়ে পড়তো। এভাবে

ব্রিটিশ সরকারের ছত্রছায়ায় খ্রিস্টবাদের ব্যাপক প্রচারণার ফলে যে বিভ্রান্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল আল্লাহ তা'আলার দয়ায় তা বিদূরিত হয়।

এমনিভাবে ঐ যমানায়ই ব্রিটিশ সরকারের মদতে উদ্ভব ঘটে কাদিয়ানী মতবাদ নামে আরেক ভয়াবহ ফেতনার। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী প্রথমে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করে, তারপর ঈসা মাসীহ হওয়ার দাবি করে, একপর্যায়ে সে নবী হওয়ার দাবি করে। তখন হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর মত ইলমী সাগরের বিখ্যাত ডুবুরী ও ছাত্র পাগল ব্যক্তিত্ব, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামলেন। তিনি তো ঐ ব্যক্তি, যিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের নসীহতী মসনদের মধ্যমণি। তিনি ছিলেন ইলমের এমন অতল সাগর যার বক্তব্য বুঝতে ছাত্রদের বেগ পেতে হত। উপস্থিত উলামায়ে কেরাম! আপনারা হয়তো ঐসকল ব্যক্তিত্ব যারা আনওয়ারশাহ কাশ্মীরী রহ. এর ছাত্রদের থেকে কিংবা তাঁর ছাত্রদের ছাত্রদের থেকে ইলম হাসিল করে থাকবেন। যাদেরকে আল্লামা কাশ্মীরী জাহেল বলে সম্বোধন করতেন। আর ঘটনাক্রমে সেই জাহেল শব্দে সম্বোধিত ব্যক্তিদের তালিকায় রয়েছেন পৃথিবী বিখ্যাত আল্লামাগণ। যথা, পাকিস্তানের আল্লামা ইউসুফ বান্নুরী, আল্লামা বদরে আলেম মিরাঠী, আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী, আল্লামা হিফজুর রহমান, কাজী যাইনুল আবেদীন, আল্লামা ক্বারী তাইয়েব রহ. যিনি দীর্ঘ দিন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন। এই সকল মহান ব্যক্তিগণের মহামান্য উস্তাদ ইলমের পর্বতসম ব্যক্তিত্ব, ইলমী ব্যতায় সর্বজন বিদিত নির্জনবাসী হওয়া সত্ত্বেও এহেন নাযুক মুহূর্তে ভাগলপুর আদালতে চলমান কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রায়ের দিন দেওবন্দ ছেড়ে ভাগলপুর আদালতে গিয়ে জজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত মজবূত প্রমাণাদির মাধ্যমে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতঃ কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করিয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন।

আল্লামা কাশ্মীরী বলেন, আমি আদালতে এই জন্যে উপস্থিত হয়েছি যে, সেদিন আমি যদি উপস্থিত না হতাম আর কাদিয়ানীদের পথে কোর্টের রায় হত, তাহলে হাশরের মাঠে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে আমি কীভাবে মুখ দেখাতাম। যদি তিনি প্রশ্ন করেন যে, আমার খতমে নবুয়াত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল, আর তুমি কিনা ইলমী অধ্যাপনায় ব্যস্ত ছিলে? এই ছিল দেওবন্দী আলেমদের আত্মমর্যাদাবোধ ও দ্বীন হেফাযতের গুরুত্ব।

এমনিভাবে যখন বেরেলবী ফেতনার উদ্ভব হলো, তখন হযরত মাওলানা মুরতাজা হাসান সাহেব বেরেলবী সম্প্রদায়ের নেতা আহমাদ রেজা খানের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দিলেন, মোনাযারা ও তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে তার সাথে লড়লেন এবং এই ফেতনাকে শক্ত হাতে প্রতিরোধ করলেন। এমনিভাবে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. ইলমী প্রমাণাদি দিয়ে কিতাব লিখে এই ফিতনার প্রতিরোধ করলেন। হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মাদসহ আরো অনেকে কিতাব লিখলেন। শেষের দিকে এসে ছারফারায খান সফদার এসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর কিতাব রচনা করেন। বিষয়গুলো এই, ইলমুল গাইব, হাজির নাজির, নূর আওর বাশারিয়্যাত, ইস্থিমদাদ বিগাইরিল্লাহ, নেদায়ে গায়েব এর মাসআলা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন, যেমনঃ 'এযালাতুল গায়েব' ' তাগরীবুন নাওয়াযেল' ' আঁখুকি ঠান্ডাক' 'চেরাগকি রউশনি' ইত্যাদি।

তারপর আসুন, লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে। তো এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. থেকে শুরু করে শাহ ইসহাক সাহেব, শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, তারপর মুফতী মাহদী হাসান রায়পুরীসহ অনেক উলামায়ে কেরাম কিতাব রচনা করেছেন। এই ফেতনা আজও জোরে শোরে চলমান। এখন এদের প্রতিরোধের দায়িত্ব আমাদের।

এভাবে মওদূদী মতবাদ যখন সামনে আসলো, তখন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এই ফিতনার বিরুদ্ধে ময়দানে নামলেন। এই ফেতনার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আওয়াজ উত্তোলনকারী হলেন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.। যখন উলামায়ে কেরামের একটি বড় অংশ মওদূদীর প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। বরং হিন্দুস্তানের বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলেমও না বুঝে তার গঠিত দলে ভিড়ে যেতে শুরু করলেন। এমনকি কেউ কেউ নিজ নিজ জন্মভূমি ছেড়ে দিয়ে শিয়াল কোটে স্থাপিত তথাকথিত দারুল ইসলামে হিজরত করা শুরু করলেন। কিন্তু হযরত মাদানী রহ. তখন এর বিরুদ্ধে আওয়ায তুললেন। তাদের দলীয় মূলনীতিতে উল্লেখ ছিল যে, আল্লাহ ও তার রাসূল ব্যতীত অন্য কাউকে সত্যের মাপকাঠি মনে করা যাবে না। একথা শুনে ঈমানী বিচক্ষণতার মূর্তপ্রতীক মাওলানা মাদানী রহ. এর কান খাড়া হয়ে গেল, তিনি একথার ব্যাখ্যা চেয়ে বললেন যে, কোনো বিষয়ে হযরত সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা ও কোনো বিষয়ে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা কি বৈধ? তখন মওদূদী সাহেব বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বৈধ। তখন লোকেরা বললো, মওদূদীর উত্তরের অন্তরালে কী লুকায়িত আছে? হযরত মাদানী রহ. বললেন, তার উত্তরের অন্তরালে এ কথা লুকায়িত আছে যে, শুধুমাত্র আবুল আলা মওদূদী ছাড়া দুনিয়ার আর যে কারো সমালোচনা করা বৈধ। চাই সে সাহাবী হোকনা কেন। তাইতো মওদুদী সাহিত্যে সাহাবায়ে কেরামকেও সমালোচনা করা হয়েছে।

মওদূদী সাহেব হযরত আয়েশা রা., হযরত মুয়াবিয়া রা., হযরত উসমানগনী রা., হযরত আবূযর গেফারী রা., হযরত আলী রা.সহ বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করেছেন। এমনকি নবীগণ আ. কেও ছাড়েননি। হযরত ইউনুস আ., হযরত মূসা আ., হযরত দাউদ আ.সহ অনেক নবীর সমালোচনা মওদূদী সাহেব করেছেন।

অতঃপর এই মওদূদী মতবাদকে খন্ডন ও এর ভ্রান্তি প্রমাণে আমাদের আকাবিরদের মধ্য থেকে প্রায় সকলেই কিতাব রচনা করেছেন। আমি এখন শুধু শেষের দিকের কথা বলছি। শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. এর মত খানকাহী জীবনের নির্জনতায় অভ্যস্ত (যার হাতে লোকদের সাক্ষাৎ দেওয়ার মত সময় ছিল না। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিনি আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টুকু ব্যতীত আর কোনো সময় কাউকে সাক্ষাৎ দিতেন না, চাই সাক্ষাৎ প্রার্থী যত বড় ব্যক্তিই হোকনা কেন। শুধু মাত্র তিনজনের ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী, মাওলানা ইলিয়াস রহ.।) ব্যক্তিও মওদূদী সাহেবের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। মাওলানা ইউসুফ বান্নুরী রহ. এর মত জগত বিখ্যাত বিদ্বান তার বিরুদ্ধে কিতাব রচনা করেছেন। আর বেশ কিছু আলেম যারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে মওদূদী সাহেবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই একের পর এক ভুল বুঝতে পেরে মওদূদী সাহেব থেকে সরে এসে দায়মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং এর উপর কিতাবও রচনা করেছেন। এর মধ্যে মাওলানা মনজুর নুমানী রহ. প্রণীত 'মওদূদীর সাথে আমার সাহচার্যের ইতিবৃত্ত' নামক বইটি অন্যতম।

আমার ভাইয়েরা! বাতিল ভ্রান্তবাঁদিদের যা কিছু নমুনা উপস্থাপন করলাম, ভারত বিভক্তির পূর্বে ও পরে অখণ্ড ভারত ও খণ্ডিত ভারতের তিন অংশের যেখানে যখন যে বাতিল আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, আমাদের আকাবিরগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্য মোতাবেক তা প্রতিরোধ করে গেছেন।

প্রিয় ভাইয়েরা! আজ আমাদের দেওবন্দী জামাআত যা প্রকৃতপক্ষে হকপন্থীদের জামাআত এবং সঠিক অর্থে মুসলমান নামে আখ্যায়িত হওয়ার উপযুক্ত, যারা আকাবিরদের নাম উচ্চারণকারী এবং তাদের রেখে যাওয়া দ্বীনী মিশনকে শক্ত হাতে ধারণকারী। আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন, অনেক জামাআত এমন আছে যাদের নিজেদের হিফাজাতের চিন্তা ব্যতীত অন্য কারো হেফাযতের চিন্তা নেই। বর্তমান এই নাযুক প্রেক্ষাপটে লা-মাযহাবী তথা গায়রে মুকাল্লিদদের ভ্রান্তি খন্ডন করা প্রয়োজন এবং মওদূদী মতবাদকে খণ্ডনকরা ও তাদের মুখোশ উন্মোচন করা প্রয়োজন। এমনিভাবে বেরেলবী, কাদিয়ানী ইত্যাদি মতবাদের খন্ডন করা প্রয়োজন।

শুধুমাত্র দেওবন্দী উলামাদের জামা'আতের অবস্থা এই যে, একদিকে তাদের দ্বীনের সহীহ তালীম হাসিল করা, অন্যদেরকে তালীম দেওয়া, অন্যের নিকট দ্বীনের তাবলীগ করার দায়িত্ব রয়েছে। অন্য দিকে দ্বীনে ইসলাম হেফাযতের দায়িত্বও তাদের কাঁধে, যেন নাম সর্বস্ব শিক্ষা-দীক্ষার ফাঁদে মুসলমানরা আটকে না যায়, কোথাও কেউ মওদূদী মতবাদের শিকার না হয়। খ্রিষ্টান ও কাদিয়ানীরা মুসলমানদের ঈমানকে হুমকির মধ্যে ফেলে না দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করি এবং অত্যন্ত দরদভরা দিল নিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আজ কাদীয়ানী মতবাদ, খ্রিস্ট মতবাদ এর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে জনগণকে সচেতন করার জন্য কয়জন লোক কাজ করছে? সহীহ দ্বীনের উপর কে কে আছে? তো এমন গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারীর চিন্তা মাথায় নিয়ে আমাদেরকে উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগতে হবে। নিজেদের দায়িত্ব পালনে যত্নবান হতে হবে।

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি বলতে চাই, আরো কয়েকটি স্থানে যা বলেছি তা হলো, শয়তান দ্বীনের সহীহ মেহনতের কর্মীদেরকে কাজ থেকে হটানোর জন্য সবচেয়ে বেশি যে অস্ত্রটি ব্যাবহার করে তাহলো, আপোষে মতবিরোধ সৃষ্টি করা। বর্তমানে সেই দুর্ভাগ্য আমাদের হকপন্থীদের সাথে যুক্ত হয়েছে। একই চিন্তাধারার অধিকারী, একই আকাবিরগণের নাম বুকে ধারণকারী, একই নিসাবে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানকারী দ্বীনের একই মিশনের কেতনধারী আলেমগণ অনৈক্য ও প্রকাশ্য মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। দুনিয়ার বড় বড় সমস্যার সমাধান তাদের মাথার উপর তারা সেগুলির সমাধান না করে মতবিরোধে লিপ্ত আছে। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে উভয় দেশের মধ্য থেকে তাদের বড় ব্যক্তিরা সন্ধির জন্য মিলিত হয় এবং তারা সমস্যার সমাধান করে উঠে। আমাদের শহরগুলোতে এ ধরণের ঘটনার অনেক নজীর রয়েছে। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছে। তখন দুই দেশের বড় বড় ব্যক্তিরা দুই দুইবার বসে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে। এসব দুনিয়াদার লোকেরা নিজেদের দুনিয়ার স্বার্থে আপোষে মতবিরোধ দূর করার জন্য বসতে পারে। কিন্তু আলেমগণের পবিত্র জামাআত দ্বীনের জন্য নিজেদের মধ্যকার মতবিরোধ দূর করতে পারবে না? নিজের ব্যক্তি সত্বার কী মূল্য আছে? নিজের আমিত্বের কি দাম? দ্বীন কি আমাদেরকে এ কথা বলে যে আপোষে যুদ্ধ করো? আসলে আমরা আমাদের প্রবৃত্তির চাহিদার বেড়াজালে আটকে গেছি।

অতএব, আজকের যুবক উলামায়ে কেরাম এ কথার উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন যে, আমরা আমাদের বড় বড় উলামায়ে কেরামকে ঐক্যের প্লাটফর্মে আনবো এবং সেজন্য তাদের পায়ে ও কাঁধে হাত রেখে খোশামোদ করে তাদের ভিতরকার অনৈক্য ও দূরত্ব দূর করে দিব। দেখুন, অনৈক্যের এই অর্থ নয় যে, বিভিন্ন মসজিদে বিভিন্ন মকতবে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে তালীম দিচ্ছেন। এটা কোনো এখতেলাফ নয়; বরং এটাতো একই ফুল বাগানের বিভিন্ন ফুলের মত দৃশ্য। যেমন ফুল বাগানে বিভিন্ন রং ও ঘ্রাণের ফুল থাকে। কোনোটি গোলাপ,কোনোটি চামেলি, কোনোটি বেলি। একেক ফুলের একেক রং ও একেক ঘ্রাণ। রং এবং ঘ্রাণের ভিন্নতা সত্ত্বেও সব ফুল মিলে মানুষকে ও পরিবেশকে সুঘ্রাণযুক্ত করে দেয়।

এমনিভাবে সকল আলেম নিজেদের আকাবিরদের ইউনিফর্ম তথা আদর্শের ধারক হবে। কিন্তু যে বিষয়গুলো মৌলিক ও ভিত্তিমূলক সেগুলোতে সবাই ঐক্যের সূতায় আবদ্ধ থাকবে। কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে না। আর যেখানে যেখানে এই বিচ্ছিন্নতা আসবে সেটা দূরীকরণের চেষ্টা করবে।

আর দ্বিতীয় জরুরী কথা হলো, এখলাসের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে দ্বীনের যে কাজ আমরা করছি হুবহু এই কাজ যদি অন্য কেউ করে তাহলে দুঃখিত না হওয়া বরং খুশি হওয়া। এক ছেলে তার পিতার খেদমতে লিপ্ত আছে। তাহলে পিতার অন্য ছেলের খেদমতে সে নারাজ হবে না, বরং খুশি হবে। এক মুরিদ তার শাইখের খেদমতে আছে, তখন অন্য মুরীদ তার শাইখের খেদমত করলে সে নারাজ হবে না, বরং খুশি হবে যদি সে সত্যিকার অর্থেই শাইখকে ভালবেসে থাকে। এক ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে দান করে তো অন্য কেউ এই প্রতিষ্ঠানে দান করলে প্রথম ব্যক্তি নারাজ হবে না, বরং খুশি হবে। যদি আবেগ এমন হয় যে, আমি একাই খেদমত করবো অন্যকে খেদমত করতে দিব না তাহলে এটা ইখলাস হবে না; বরং তা হবে নিজের সুনাম সুখ্যাতির জন্য।

আমরা সকলেই দ্বীনের কাজে ব্যস্ত, তো একজন আলেম একটি প্রতিষ্ঠান বা একটি সংগঠন বানিয়ে কাজ নিয়ে দাঁড়ালেন, এমতাবস্থায় তার সহযোগী হতে হবে। তার বিরোধী হলে চলবে না। কেননা সে ঐ কাজই করছে যা আমি করছি। যে কেউ দ্বীনের আওয়াজ উঠাবে , পতাকা যার হাতেই থাকুক না কেন, নাক সিটকানো যাবে না। কোথাও একহাজার লোক জামা'আতে নামায আদায় করার জন্য জমা হলে, তার মধ্যে হয়তো এমন একশত লোক আছে, যারা সকলেই ইমামতী করতে পারে। কিন্তু একশত লোকই তো ইমামতী করবে না, বরং ইমামতী একজনই করবে। আর বাকী সবাই তাকে ইমাম হিসেবে মেনে নিবে। এখন অবশিষ্ট ৯৯ জন জুতা হাতে নিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় কিংবা ইমাম সাহেবের জায়নামায কেড়ে নিয়ে বলে যে, ইমামতির যোগ্য আমি, অতএব আমি ইমামতি করবো। এ জাতীয় আচরণ করা কি কখনোই সমীচীন হবে? নাকি একজনের ইমামত মেনে নিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় উচিত হবে? এক ব্যক্তি ইমামতির জায়গাতে দাঁড়িয়ে গেছে এটাতো অন্যদের জন্য কোনো অসম্মানের বিষয় নয়। কেননা বিষয়টি এমন নয় যে, ইমামতিতে দাঁড়ালে সম্মানিত হবে আর মুক্তাদি অসম্মানিত হবে। ছাত্র ইমামতি করছে আর শাইখুল হাদীস সাহেব তার পিছনে নামায পড়ছেন। মাদানী সাহেব ছাত্রের পিছনে নামায পড়ছেন, কোথাও ছেলে ইমামতি করছে বাপ, দাদা তার পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়ছে। তাদের জেহেনে একথা আসে না যে, একে ইমাম বানানোর দ্বারা তাদের পদমর্যাদা নষ্ট হবে। কেননা প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, নামায জামা'আতের সাথে পড়া হবে। এই দৃশ্য প্রতিদিন পাঁচবার সামনে আসছে আর সবাই তাতে অংশগ্রহণও করছে। এমনিভাবে দ্বীনের কোনো কাজ যখন দলবদ্ধভাবে করা হয়, তখন তার মধ্য থেকে একজন সামনে নেতৃত্ব দিল আর আমি তার নেতৃত্ব মেনে নিলাম। এতে কি আমার মান সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে? এতে সম্মান আরো বৃদ্ধি পাবে। এটা না করে কেউ যদি মনে করে যে, আমার মধ্যেও নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা আছে। অতঃপর ভিন্ন একটা দল গঠন করে সে নেতা হয়ে যায়। তাহলে দ্বীনের লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হবে। সব জায়গায় আজ বাস্তবতা দৃশ্যমান হচ্ছে। তো যুবকগণ হচ্ছে একটি জাতির শক্তি। সংসারে কোনো যুবক যদি এই জিদ ধরে যে, মা-বাপের মধ্যকার গন্ডগোল খতম করবে তাহলে তা সম্ভব হয়ে যায়। এটা না করে ছেলে যদি একদিকে থাকে, আর বাপ অন্য দিকে যায় তাহলে গন্ডগোলের নিরসন হবে না। আজকের নওজোয়ান তোলাবা ও উলামাদের শিক্ষা-দীক্ষা জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই। আমাদের মধ্যকার বড় বড় উলামায়ে কেরাম যদি পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের দর্শন ও আদর্শকে, ত্যাগ ও অগ্রাধিকারকে সামনে রাখেন, তাহলে পরবর্তীদের জন্য এটা হবে অনুসরণীয় বিষয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই নেতা হওয়ার যোগ্য। পদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু মুসলিম জাতির ঐক্যের স্বার্থে আপোষের ঝগড়া খতম করে দিয়ে সহীহ পদ্ধতি ও এখলাসের সাথে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে।

সারকথা, আমি আপনাদের সামনে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।
এক. বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশিত ফেতনার দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখা এবং সে সব ফেতনা দমনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রত্যেকেই এটাকে নিজের দায়িত্ব মনে করা। মওদূদী মতবাদ আমাদের আকিদা ও আমাদের আমলের উপর আক্রমণ করছে, খ্রিস্ট মতবাদ আমাদের সরলমনা মুসলিম ভাইদের খ্রিস্টান বানাচ্ছে। কাদিয়ানীরাও ঈমানের উপর হামলা করছে। তো যেভাবে আমাদের আকাবিরগণ এসকল ফেতনার মোকাবেলা করেছেন সেভাবে আমরাও এর মোকাবেলা করা নিজেদের দায়িত্ব মনে করব।

দুই. যে কেউ দ্বীনের সহীহ খেদমত আঞ্জাম দিবে তার সহযোগিতা করবো। বিরোধিতা করবো না। কেননা আমি যেমন নায়েবে রাসূল তেমনি সেও তো একজন নায়েবে রাসূল।

আর দ্বীনের কাজ বলতে মৌলিকভাবে নববী কাজকেই বুঝায়। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাজের ধারা ছিল তিনটিঃ
১.কিতাবুল্লাহ ও হিকমাত তথা সুন্নাহ শিক্ষাদান।
২.তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি।
৩.দাওয়াত ও তাবলীগ।

এগুলোকেই মূলত প্রকৃত নববী কাজ বলে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তা'লীমের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে, খানকাহগুলো তাযকিয়ার কাজ করছে, আর তাবলীগওয়ালারা দাওয়াতের কাজ করছে। এগুলোর সবই দ্বীনী কাজ। এগুলোর যেটার প্রতি যার দিলের ঝোঁক বেশি সে তাতে লেগে থাকবে। অন্যগুলোকে অস্বীকার করবে না। মাদরাসাওয়ালা যদি একথা মনে করে যে, আমরাই তো দ্বীনের কাজ করছি। দাওয়াতের লাইনের লোক দ্বীনের কাজ করছে না। এটা চরম ভুল হবে। দাওয়াত ওয়ালার একথা মনে করা যে, দ্বীনের কাজতো শুধু আমরাই করছি, মাদরাসা ওয়ালারা দ্বীনের কাজ করছে না এটাও ভুল হবে। আর খানকাহওয়ালারা যদি এটা মনে করে যে, দাওয়াতের লাইনের লোকেরা কী জানে? হাকীকত ও প্রকৃত জিনিস তো আমাদের কাছে রয়েছে। এটাও ভুল হবে। আল্লাহ পাক বলেনঃ وقال ايضا ...هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة... وقال ايضا قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى.

তো যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নায়েব তথা ওয়ারিশ দ্বীনের সকল কাজ নিয়ে চলা তাদের দায়িত্বে। যার যেটার প্রতি মনের ঝোঁক বেশি সে সেটা করবে। আর অন্য গুলোকে সমর্থন ও সহযোগিতা করবে, বিরোধিতা মোটেই করবে না। এ পদ্ধতিতে ইনশাআল্লাহ দ্বীনের কাজ অনেক বেশি হবে। চোখের কাজ দেখা আর কানের কাজ শোনা, জিহ্বার কাজ বলা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। এমন নয় যে, চোখকে দেখার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে শ্রবণ ও বলার দায়িত্বও পালন করতে হবে। বরং দেখবে চোখ, বলবে জিহ্বা, আর শুনবে কান। তবে প্রত্যেকেই অপরের সহযোগী। এমনিভাবে সকল নায়েবে রাসূল দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছেন। অতএব, আপোষে একে অপরের সহযোগী হতে হবে।

আপনাদের সমীপে আর একটি আবেদন এই যে, উর্দূ ভাষা ও ফার্সী ভাষা ছাত্রদেরকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে পড়াবেন। উর্দূ-ফার্সী যদিও মাতৃ ভাষা নয়, কিন্তু এই দুই ভাষা আমাদের দ্বীনী খেদমতের ও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে গেছে। আমাদের আকাবিরদের সকল কিতাব উর্দূ ও ফার্সীতে লেখা। সেগুলো থেকে উপকৃত হতে গেলে এই দুই ভাষা শিখার বিকল্প নেই। কোনো ভাষার অস্থিত্ব বাকি থাকে সেই ভাষায় শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ ও সেই ভাষা বলার মাধ্যমে। আমরা উলামায়ে কেরাম যদি এই দুই ভাষাকে টিকিয়ে না রাখি, শিক্ষা না দেই, তাহলে এই ভাষাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আর কে পালন করবে? সাধারণ মানুষ তো এই দায়িত্ব পালন করবে না। সুতরাং এই দুই ভাষাকে নিসাবভুক্ত করে গুরুত্বসহ পড়াবেন।

যাইহোক, আপনাদের সামনে বিক্ষিপ্ত কিছু কথা আলোচনা করলাম। এসব কথার প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি আমি নিজেই। যদি কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে মাফ করে দিবেন। আর যদি কিছু কাজের কথা বলে থাকি, তাহলে সেগুলো আপোষে আলোচনা করে কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায় তার ফিকির করবেন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين